International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VI, July 2016, Page No. 1-9
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

রাষ্ট্রহীন ‘চাকমা’ সম্প্রদায়ের (পূর্ব পাকিস্থান, বাংলাদেশ, ভারত) একটি অবিচারের কাহিনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (১৯৬৪-১৯৮৬)

অভিজিৎ বাগ
জুনিয়র রিসার্চ ফেলো (ইউ. জি. সি, আর. জি. এন. এফ) ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

Abstract

‘Chakma’, a Mongoloid Buddhist tribe who were residing to North- Eastern states of undivided India. There were some small tribe groups. Chakmas were the one of the two biggest tribe communities among them who were dominating this C.H.T (Chittagong Hill Tracts) region. The area was once under controlled by British rulers of India. But the CHT is a integral part of Bangladesh now. The CHT was declared as a “Fully Excluded Area” by the act of 1935 by the British Indian rulers. India got its independence from British rule on the fifteen day of August, 1947 and then the CHT was included into Pakistani territory. But the same CHT region was again included into Bangladesh in 1971, when it had got independence from Pakistani regime. But the problem is, after the several decades, the Chakmas have been remained stateless, they are refused to get citizenship by any sovereign states irrespective of Pakistan, Bangladesh, or even India. Though chakmas should have been granted citizenship by India and Bangladesh also, but it is regret to say that nothing has been made in favour of chakmas to live prestigiously in Bangladesh and even in India.

Key words: Chakma community, C.H.T area, Pakistan, Bangladesh, Arunachal Pradesh, India, stateless.

‘চাকমা’ একটি মোঙ্গলীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রাচীন ক্ষুদ্র জনজাতি, যারা অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে (উত্তর-পূর্ব) বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতেন। ব্রিটিশ গবেষক বা স্কলারদের উচ্চারণগত স্বতন্ত্রতার জন্য আমরা এঁদের ‘Chukma’ বা ‘Chakma, নামে চিনলেও এই সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি নিজেদেরকে SAWNGMA OR CHAWNGMA নামে পরিচয় দেন।[১] স্থানীয় ভাষায় তাঁরা ‘জুম্মা’ (Jumma people) নামে পরিচিত। ‘চাকমা’ শব্দটি খুবই সাম্প্রতিক, যার দ্বারা CHT অঞ্চলের সংখ্যাগুরু উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের বোঝানো হয়েছে। বার্মাতে এই জনগোষ্ঠী ‘TSAK-THEK’ নামে পরিচিত।[২] এই সি. এইচ. টি অঞ্চলটি ২১° ২৫° এবং ২৩° ৪৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৯১° ৪৫° এবং ৯২° ৫০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তের অন্তিম বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনটি জেলা যথা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, বন্দারবন এবং খাগরাচারি নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। এই অঞ্চলটির মোট আয়তন ১৩১৮১ স্কোয়ার কিমি বা ৫,০৮৯ স্কোয়ার মাইল। এই তিনটি জেলার উত্তরভাগে রয়েছে ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরা, পশ্চিমভাগে রয়েছে চট্টগ্রাম জেলা, দক্ষিণভাগে বার্মা (মায়ানমার) এবং পূর্ব দিকে বার্মিজ আরাকান পার্বত্য অঞ্চল এবং লুসাই পর্বত । এই সি এইচ টি এলাকায় বসবাসকারী অনেকগুলি

সতন্ত্র ছোটো ছোটো উপজাতিগুলির মধ্যে দুটো সর্ববৃহত জনগোষ্ঠী হল 'চাকমা' এবং 'মারমা'। এখানে আলোচ্য বিষয় 'চাকমা'দের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের আচার আচারণগত এবং সংস্কৃতিগত কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ ভারত সরকার এই 'চাকমা' সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, তাই এই সি. এইচ. টি. এলাকাকে "চিটাগাও হিল ট্রাকস রেগুলেশন" আইন, ১৯০০ (Chittagong Hill Tracts regulation act,1900) দ্বারা 'বহিরাগত অঞ্চল' (Excluded area) বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৫ খ্রিঃ ভারত শাসন আইন দ্বারা এই এলাকাকে পুনরায় 'সম্পূর্ণ বহিরাগত অঞ্চল' (Fully Excluded Area) বলে ঘোষণা করা হয়।[৩]

ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র ও উচ্চারণগত বিভিন্নতার জন্য CHAWNGMA বা CHUKMA ইত্যাদি বিভিন্ন নাম থাকলেও আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে এই উপজাতির সদস্যদের 'চাকমা' নামেই সম্বোধন করা হল। এই 'চাকমা' শব্দের অর্থ যাঁরা TSAK বা THEK গোষ্ঠী বা উপজাতির সদস্য, যারা আবার 'বার্মিজ' উপজাতির বংশধর। আরাকান পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি বা উপজাতির মানুষ বসবাস করতেন যেমন Khuime বা Owe, Khey ইত্যাদি। তবে ব্রিটিশ গবেষকদের মতে চাকমারা হলেন Khyeng-tha জাতির শাখাভুক্ত মঙ্গোলীয় পরিবার। আরাকান শব্দ Khyeng-tha-র অর্থ, সেই জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুষ যাঁরা জলের কাছাকাছি বসবাস করেন। বার্মিজ উচ্চারণ Khy-Chaw বা Khyeng-tha থেকে Chaw-eng-tha শব্দটি এসেছে যার অর্থ হল 'চাকমা'। এই চাকমাদের অতীতের গৌরবজনক অধ্যায়ের কথা আমাদের কাছে এখনও অজানা থেকে গেছে, কারণ এই বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা এখনও পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। বার্মিজ ভাষানুযায়ী 'চাকমা'রা Tibeto-Burman গোষ্ঠীর মানুষ (Thet অথবা sak people), যাঁরা এই জায়গায় (সি. এইচ. টি) এসেছিলেন বার্মা দ্বারা আরাকান রাজ্য ধ্বংস হওয়ার অব্যহতি পরে । বার্মিজ প্রশাসনের বিরোধী আরাকানরা এই অঞ্চলে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন এই সি. এইচ. টি. এলাকাটি ব্রিটিশ প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ছিল।[৪]

আরাকান ঘটনাপঞ্জি অনুযায়ী বাংলার রাজারা আরাকান সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন, যখন এই রাজ্য তার ক্ষমতা ও বৈভবের শীর্ষে অবস্থান (১১৩৩ সাল) করছিল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে আভা এবং সেগুর মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ তাঁদের প্রতিবেশী রাজ্য আরাকানকে বেশ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রেখেছিল এবং এই সুযোগে তাঁরা চট্টগ্রামের দিকে তাঁদের আধিপত্য স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। বারো শতকের প্রথমদিক থেকেই আরাকান অঞ্চল থেকে আগতরা ধীরে ধীরে সি. এইচ. টি. অঞ্চলের পাহাড়ি ঢালগুলির কাছাকাছি চলে আসতে থাকেন। আরাকানের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়েছিল ১৩৭৪ সাল নাগাদ, যখন আরাকান রাজ মিন্টো শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অন্যায়ভাবে চাকমা রাজা মারেকয়াজা (Marekyaja) কে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। মারেকয়াজা বাংলায় পলায়ন করেন। সেই সময় গৌড়ের রাজা আহমেদ শাহ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। বাংলার নবাব জালালউদ্দিন মহম্মদ (১৪১৮-৩১) চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে চাকমারাজাকে আশ্রয় দেন। সেখানে অর্থাৎ মাতামৌরি নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে চাকমা প্রধান তাঁর প্রথম রাজধানী (আলিকাদাম) স্থাপন করেছিলেন। বিখ্যাত চাকমা লোকগাথাঁ 'রাধামন' এবং 'ধনপতি' থেকে এই সময়ের কথা জানা যায়। অন্য আরও একটি চাকমা লোকগাঁথা (গেজ্ঞখূলী) থেকে আরাকান রাজের বিরুদ্ধে চাকমাদের বিজয়ের কাহিনি জানা যায়। এখানে বাংলার নবাব চাকমাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। চাকমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বাংলার নবাবদের সঙ্গে তাঁদের কোনও বিরোধ ছিল না। তবে চাকমা রাজাদের মুসলমান নাম বা উপাধি গ্রহণের পিছনে অন্যতম কারণ ছিল বাংলার নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। তবে এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি।

চট্টগ্রাম (পুরানো নাম সপ্তগ্রাম) অঞ্চলটি এমন একটি স্থান যা এক এক সময়ে পর্তুগীজ-আরকান-আফগান-পাঠাণ-মোগল এবং শেষে ব্রিটিশদের হস্তগত হয়েছিল। বাংলার আধিপত্য নিয়ে মোগল-আফগান সঙ্কটের সময়ে (ষোল শতাব্দীর শেষে) চট্টগ্রাম শহর আরাকান রাজ পুনরায় জয় করেছিলেন বলে মনে করা হয়। চাকমাদের

ইতিহাসে এই সময়টা 'Mughar Mulluk' (Unruly lawless country) বলে পরিচিত।[৫] বাংলার গভর্নর শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪-৬৫ সালে বারংবার আরাকান আক্রমণ বন্ধ করার জন্য আরাকান রাজের বিরুদ্ধে এক বড় অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই সামরিক অভিযানের ফলে মেঘনা নদীর সম্মুখবর্তী কয়েকটি দুর্গ এবং চট্টগ্রাম শহরসহ শত্রুপক্ষের অধীনে থাকা বেশ কিছু এলাকা তিনি অধিকার করতে সক্ষম হন। এই এলাকা ১৬৬৫ সালে মুঘল শাসক উমেদ খানের অধীনে আসে, তিনি এর নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামাবাদ' রাখেন। ১৭৬০ সালে বাংলার গভর্নর মির খান ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চট্টগ্রাম শহর সমর্পণ করেন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, শায়েস্তা খাঁনের সময়কালে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে চাকমারা যখন শাসন করতেন তাঁরা তখন কোনও নজরানা বা খাজনা মুঘল শাসককে দিতেন না।

তবে যাইহোক বাংলার গভর্নর মির খান ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে এক চুক্তির ফলে কোম্পানি মুঘলদের থেকে চট্টগ্রামের নিজামপুর রোডের পশ্চিমভাগ অধিকার করে (অধুনা ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড) এবং চট্টগ্রামের বাকি অংশ চাকমাপ্রধান রাজা শিয়র মাস্ট খানকে সমর্পণ করা হয়। কোম্পানি ১৭৬৩ সালে একটি ঘোষণা দ্বারা ওই অঞ্চলটির চাকমাদের আঞ্চলিক বিচারবিভাগীয় (Territorial Jurisdiction) স্বাধীনতা মেনে নেয়। এইভাবে চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। দীর্ঘ সময়কাল ধরে চাকমাপ্রধান ও বাংলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে কর আদায়ের হার নিয়ে (Tax fixation) বিরোধ চলেছিল। পরবর্তীকালে তা মিটে গেলেও কোম্পানির আমলে চাকমাদের ওপর আরোপিত করের হার বা পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ায় চাকমাপ্রধান এতে বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্যে প্রায় ২৪ বছর ধরে চাকমাপ্রধান কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিদ্রোহী চাকমাদের দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৭৭২, ১৭৭৭, ১৭৭৮, ১৭৮০, এবং ১৭৮২ সালে বড় বড় কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।[৬] বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নমনীয় ও সহনশীল নীতি গ্রহন করেছিলেন। ফলে চাকমা প্রধানের সঙ্গে কলকাতার ফোট উইলিয়ামে এক শান্তিচুক্তি (১৭৮৭ সালে) স্বাক্ষরিত হয় এবং করের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। প্রথমে মুঘলরা যেমন নীতি গ্রহন করেছিলেন ঠিক তেমনই কোম্পানিও এঁদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অর্থাৎ সি. এইচ. টি. অঞ্চলের প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কোম্পানির হাত থেকে শাসন ক্ষমতা যখন স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে তখন রাজা ধরম বুকস খানের (১৮১২-৩২) বিধবা পত্নী কালেন্দি রানী (১৮৩২-৭৩ সাল) চাকমা সিংহাসন আসীন ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর সিংহাসন আরোহণ সমর্থন করেছিলেন। তাঁর চল্লিশ বছরের শাসনকালে তিনি কখনও ব্রিটিশদের প্রতি অতি সদ্ভাব দেখাননি, যদিও তিনি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উপজাতিদের আক্রমন থেকে 'চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক' কে রক্ষা করার জন্য এবং এই অঞ্চলটিকে দেখভালের জন্য সুপারিন্টেনডেন্ট পদাধিকারী একজন অফিসার নিয়োগের কথা বলা হয়। ১৮৬০ সালে এই আইন বলে সি. এইচ. টি. -র জন্য আলাদা সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটির বলে ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা দিতে স্বীকৃত হয়।[৭] এই আইন দ্বারা ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে এই পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একজন সুপারিন্টেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়। এরপর থেকে এই অঞ্চলটি "হিল ট্র্যাকস অফ চিটাগাঁও" নামে পরিচিত হয়। কালেন্দি রানী ছিলেন চাকমাদের শেষ স্বাধীন শাসক। ১৮৬০ সালে আইন দ্বারা সি. এইচ. টি. এলাকাকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়, যথা ক. চাকমা, খ. বোহমাং, গ. মাউন। এরপর ১৯০০ সালে সি.এইচ. টি রেগুলেশন আইন দ্বারা উক্ত অঞ্চল 'Excluded Area' এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে এটিকে 'Fully Excluded Area' ঘোষণা করা হয় (পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে)।

বাংলা সীমান্ত কমিশনের সভাপতি স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের ঘোষণা অনুযায়ী (১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল) সি. এইচ. টি. (৯৮% জনগণ মোঙ্গলীয় ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী) অঞ্চলটি সার্বভৌম ইসলামীয় রাষ্ট্র (জন্ম-১৪ ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সংখ্যালঘু মোঙ্গোলীয় জাতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ

ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার পরেই সি. এইচ. টি. বাসিন্দাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধে। প্রখ্যাত চাকমা নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে এক চাকমা প্রতিনিধি দল দিল্লীতে এসে তাঁদের এলাকাকে ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। র‍্যাডক্লিফ ঘোষণার বিরুদ্ধে চাকমাদের মধ্যে থেকে প্রথম ছাত্রসমাজ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, যেমন এঁদের কয়েকজন হলেন– ঘনশ্যাম দেওয়ান, স্নেহ কুমার চাকমা, ললিত কুমার চাকমা প্রমুখ। যেহেতু বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে উৎপত্তি হয়েছিল তাই চাকমারা তাঁদের এলাকাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার দাবি জানান। অন্যদিকে পাকিস্থানের মুসলিম নেতৃত্ব চাকমাদের অসন্তোষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে না গিয়ে চাকমাদের ওপর দমনপীড়ন শুরু করে দেন। ফলে এই এলাকা থেকে অনেকেই (চাকমারা) সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের উত্তর পূর্বের সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলিতে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিতে থাকেন। তাঁদের অসন্তোষের প্রধান কারণ নিহিত ছিল, -এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই তাঁদের এলাকাকে পাকিস্থানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার মতো আমানবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে গণভোটের (Referendum) দ্বারা তাঁদের মতামত জানানোর কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন কল্পনা করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন, এই সংযুক্তিকরণ যেন কোনভাবে আটকানো যায়। আসন্ন ভারত বিভাগ দ্বারা যেন সি. এইচ. টি. এলাকাকে পাকিস্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করা হয় এবং তাঁদের অঞ্চলকে যেন ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয় – এই দাবি নিয়ে তাঁরা বাংলা সীমান্ত কমিশনের সভাপতি র‍্যাডক্লিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আরও বলেন যে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু সভাপতি তাঁদের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করতে পারেন নি। তাঁরা এ বিষয় নিয়ে জওহরলাল নেহেরু'র সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। নেহেরু তাঁদের দাবি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন। এতে চাকমা নেতৃবিন্দ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন তাঁদের দাবিদাওয়া হয়ত মেনে নেওয়া হবে । কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যায় তাঁদের কোনও দাবিই গ্রাহ্য করা হয় নি। চাকমাদের সমস্যা নিয়ে কোনও আলোচনা ছাড়াই নিজের (র‍্যাডক্লিফের) একক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সি. এইচ. টি কে. বাঙালি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান অর্থাৎ সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মোঙ্গলীয় চাকমাদের ন্যায্য দাবী, ঐতিহ্য, মানবাধিকার ইত্যাদি লঙ্ঘিত হয়। ফলে সি. এইচ. টি. অঞ্চল থেকে অনেক উপজাতি চাকমা সম্প্রদায়ের সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ ইত্যাদি ভারতের উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে সি. এইচ. টি. অঞ্চলের সমগ্র জনসংখ্যার ৯৭.৫% মোঙ্গলীয় উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং বাকি প্রায় ১.৫% বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।[৮] এই অঞ্চলের সমগ্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল জুমচাষ । এই অঞ্চলের ভূমি উর্বর থাকায় কৃষি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । কিন্তু স্বাধীন পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনের পর রাষ্ট্রশক্তি সেখানকার অর্থাৎ সি. এইচ. টি. এলাকার সংখ্যাগুরু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমাদের উক্ত অঞ্চলের উপর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায়ে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে ওই বিশেষ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে উৎসাহ দেয়। এই নতুন বাসিন্দাদের জন্য এখানে আধুনিক বিভিন্ন শিল্প, কাগজমিল এবং 'ক্যাপটাই হাইড্র ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট' প্রভৃতি (Kaptai Hydro Electric Project) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সমস্ত পরিকল্পনার ফলে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এই অঞ্চলের বাইরের অনেক মানুষজন (Non-tribal) এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। কে. এইচ. ই. পি. (K. H. E. P) প্রকল্পের ফলে সৃষ্টি হওয়া জলোচ্ছাসে চাকমা বসতির এক বিস্তীর্ণ এলাকা জলপ্লাবিত হয়ে পরে। প্লাবিত অঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য কোনও পর্যাপ্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি।[৯] উপরন্তু রয়েছে পাকিস্থানী রাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত সামরিক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার । চাকমা'রা একদিকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বলি হন এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁরা ভারতের উত্তর-পূর্বের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে আশ্রয়ের আশায় সি এইচ টি অঞ্চল

ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যে অঞ্চলকে শেষ প্রায় তিন'শ বছর চাকমারা নিজেদের মাতৃভূমি হিসেবে দেখে এসেছেন সেই সি. এইচ. টি. এলাকা ত্যাগ করে এঁদের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ ভারতে প্রবেশ করেনত। ১৯৬৪ সালে প্রায় ৪০,০০০ চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে এসে শরণার্থীর জীবন বেঁছে নিতে বাধ্য হন।[১০] তাঁরা সে সময়ে এদেশের (ভারত) নেফা (NEFA or North Eastern Frontier Agency) অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমানের অরুণাচল প্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন।[১১] এইভাবেই প্রায় ২০,০০০ মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে বার্মার আরাকান পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নেন। এই সুযোগে এক বিপুল সংখ্যাক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ এই সি. এইচ. টি. অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৬৪ সালের মধ্যে এই অঞ্চলের প্রায় এক লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হন, এঁদেরকে অনেকে 'Environmental Refugees' বলেছেন ।

সি. এইচ. টি. অঞ্চলের বসবাসকারী চাকমা'দের দুর্দশা এখানেই শেষ হয়নি, এরপর যখন পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিম পাকিস্থান থেকে অর্থাৎ পাকিস্থান থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা নতুন রাষ্ট্র, আধুনিক বাংলাদেশ গঠন করেন, সেই নব গঠিত দেশেও চাকমারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজতে ব্যর্থ হন। এখানেও তাঁরা নানারকম শোষণ, বঞ্চনার সম্মুখীন হন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাকিস্থানের মতো বাঙালি মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলাদেশের সরকারও মোঙ্গলীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি দেখাননি, বরঞ্চ তাঁদেরকে সরকারি গুণ্ডা বাহিনীর দমন পীড়নের মুখোমুখি হতে হয়েছে । ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে আঠারোজন উপজাতি নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি (প্রথম) মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সি. এইচ. টি. অঞ্চলে তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার্থে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁদের দাবি উত্থাপন করেন। [১২] তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল যেমন- সি. এইচ. টি. অঞ্চলের স্বায়ত্ব শাসন, এই অঞ্চলে উপজাতি ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ইত্যাদি। কিন্তু উপজাতি নেতাদের কোনও দাবিই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচ্য বলে মনে হয়নি। ফলে প্রতিনিধি দলকে একরাশ হতাশা নিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হয়। সি. এইচ. টি. অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমাদের কাছে আবেদন নিবেদন করার সবরকম পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চাকমাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ, অসহায়তা, নিরাশা ও হতাশাবোধ প্রকট হয়। নিজভূমে পরবাসী হওয়ার যন্ত্রণা তাঁরা ভুলতে পারেনি ফলে তাঁরা শেষপর্যন্ত বিকল্প পথের সন্ধান করতে বাধ্য হন।

এসময়ই 'রাঙামাটির কমিউনিস্ট পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে (১৬মে, ১৯৭২সাল)। এই দলের অন্য একটি নাম হল 'জন সংহতি সমিতি'। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই দলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই সমিতির অধীনেই ১৯৭৩ সালে ৭ই জানুয়ারী 'শক্তি বাহিনী'(গণমুক্তি ফৌজ) নামে একটি সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠিত হয়। এছাড়াও ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি (P.C.J.S.S)।[১৩] চাকমারা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তবে ১৭৭৩ সালের বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্র লারমা এবং চাইটোয়ী রৌজা (Chaitoai Rouza) সি. এইচ. টি. থেকে নির্বাচিত হয়ে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভায় চাকমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানান। এই ভাবে বিভিন্ন ঘটনাবলী বাংলাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ফলে বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। শান্তিবাহিনীর অনেক নেতা আত্মগোপন করেন। অনেক বিদ্রোহী নেতা ও কর্মীবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭৫ সালে সি. এইচ. টি.অঞ্চলের ৬৭ জন প্রতিনিধির একটি দল দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল রহমানের নিকট তাঁদের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু এবারেও তাঁদের কোনও অনুরোধ বা আবেদন বিবেচনা করা হয় নি । ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের নাগরিকদের নাগরিকত্বের পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশী' করা হয়। ১৯৮০ সালে এর সঙ্গেই সি. এইচ. টি.কে 'উপদ্রত এলাকা' (Disturbed Are) বলে ঘোষণা করা হয়।[১৪] এরপর বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী দ্বারা সি. এইচ. টি. এলাকার চাকমাদের উপর দমন-পীড়ন শুরু হয়। প্রায় ৫০,০০০ বাঙালি মুসলমান কৃষককে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হয়।

তাঁদের নানারকম সুযোগ সুবিধা যেমন- রেশনিং ব্যবস্থা, ডোল ইত্যাদি দেওয়া হয়। এরফলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমারা আরও সহায়সম্বলহীন অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হন। তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহীদের আন্দোলন সম্পূর্ণ দমন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপরেই কালামপাটি হত্যাকাণ্ডের (২৫ মার্চ, ১৯৮০সাল) ঘটনা সংঘটিত হয়। অনেক ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, সম্পত্তি লুটপাট ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বহু মানুষকে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে আবার 'শান্তিবাহিনী' দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও সংঘটিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সেনাবাহিনী দ্বারা অতিরিক্ত দমনপীড়নের ফলে 'শান্তিবাহিনী'র অনেক সদস্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৯৮৬ সালে প্রায় ৭০,০০০ 'চাকমা' উপজাতির মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেন।[১৫] ১৯৬৪ সালের পর ভারতে এটাই সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যাক মানুষের অনুপ্রবেশের ঘটনা।

কোনও দেশের স্বাধীনতা লাভ যে, সে দেশের কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের আশ্রয়হীন, আরো দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলতে পারে তার প্রকৃত উদাহরণ বাংলাদেশের সি. এইচ. টি. অঞ্চলের বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের 'চাকমা'রা। এই অঞ্চলে প্রায় ৩০০ বছর ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা সত্ত্বেও তাঁরা আজও কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন নি। দেশভাগের পর রাষ্ট্রহীন হওয়ার ফলে কোন সার্বভৌম দেশের যে সুযোগসুবিধা ও অধিকার কোন জাতি লাভ করে থাকেন, স্বাধীনতা লাভের ৭০ বছর পরেও তা থেকে চাকমারা বঞ্চিত রয়ে গেছেন। কিন্তু এঁদের এই সীমাহীন দুঃখকষ্ট, হতাশাময় জীবন এবং অবিরাম শোষণ নিষ্পেষণের পিছনে দায়ী কে, কারা ? দীর্ঘকাল ধরে তিব্বতীয়-বার্মা গোষ্ঠীর মোঙ্গলীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'চাকমা'রা একসময়ে চাকমা রাজাদের অধীনে সি. এইচ. টি. অঞ্চলে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে বসবাস করতেন। মুঘল আমলে চাকমাদের তেমন কোন কর বা খাজনা কোষাগারে জমা দিতে হত না (১৭১৩ সাল পর্যন্ত, পূর্বে উল্লেখিত)। চাকমারা বাংলার মুসলমান শাসককে নামমাত্র কর দিতেন এবং স্বাধীনভাবেই বসবাস করতেন। কিন্তু ১৭৬০ সালের পর থেকে 'চাকমা'রা তাঁদের দেয় করের পরিমাণ নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করতে লাগলেন । কারণ তখন কোম্পানির অধীনে 'চাকমা'দের অনেক বেশি পরিমাণ কর দিতে হত। ১৯০০ সালের রেগুলেশন (For the good Government of CHT Regulation,1900) দ্বারা এই অঞ্চলের জনগণের স্বায়ত্ব শাসনের (Self-Governance) ক্ষমতা সীমিত করা হয়। তবে যাইহোক ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আগে পর্যন্ত 'জুম্মা' রা (Jumma People, স্থানীয় ভাষায় চাকমারা 'জুম্মা' নামে পরিচিত)[১৬] ব্রিটিশ ভারত সরকারের অধীনে থেকেও একপ্রকার স্বাধীনভাবেই জীবনধারন করতেন। সি. এইচ. টি. অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে তাঁরা একরকম সুখ এবং শান্তিতেই জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁরা অযথা ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কোন কাজের বিরোধিতা করতেন না, তেমনই তাঁরা সরকারের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদর্শনও করতেন না। তাঁরা নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। কিন্তু দেশভাগ এঁদের জীবনে এক সঙ্কট বা ট্র্যাজেডি নিয়ে হাজির হয়। নবগঠিত পাকিস্থান সরকার প্রথম থেকেই এঁদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেনি । বরঞ্চ তাঁদের নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। তাঁদের নাগরিক অধিকার পাকিস্থান সরকার স্বীকার করতে সম্মত হয় নি । যদিও ব্রিটিশ সরকার দ্বারা দেশভাগের ফলে আইনানুসারে 'চাকমা'রা পাকিস্থানের স্বাভাবিক নাগরিক অধিকারে পরিণত হয়েছে। তাঁদের উপর প্রথম বড় আঘাত হানা করা হয় যখন পাকিস্থানের প্রথম সংবিধানে সি. এইচ. টি. এলাকাকে বহিরাঞ্চল (Excluded Area) বদলে 'Tribal Area' বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে ১৯৬৩ সাল থেকেই পাকিস্থানের সি. এইচ. টি. এলাকার জনগণের বিশেষ অধিকার কার্যত বিলুপ্ত হয়। এরপর ১৯৬৪ সালে KHEP কে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে প্রথম ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় (পূর্বে উল্লেখিত)। প্রচুর মানুষ ঘর ছাড়া হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে তাঁরা সীমানা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রায় ৪০,০০০ মানুষ (পূর্বে উল্লেখিত) ভারতের NEFA (পরবর্তীকালের অরুণাচল প্রদেশ) ভূখণ্ডে আশ্রয় নেন।

কিন্তু সমস্যা হল তৎকালীন NEFA বা পরবর্তীকালের অরুণাচল প্রদেশ সরকারও এই চাকমাদের নাগরিক অধিকার দিতে রাজি হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভোটাধিকার, কর্মসংস্থান ইত্যাদি নূন্যতম নাগরিক অধিকার থেকে এই সরকার নানা অছিলায় চাকমাদের প্রায় ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বঞ্চিত করে রেখেছে। এমনকি এই ৫০ বছরের মধ্যে যে সব চাকমা যুবকেরা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন তাঁরাও ভোটাধিকার লাভ করেননি। ফলে তাঁদের এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। এঁদের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য পালন, ধর্মাচরণ, ভোটাধিকার ইত্যাদি পূর্ণ নাগরিক অধিকার দেওয়া হলে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী অরুণাচল প্রদেশের স্থানীয় অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে, প্রদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বিনষ্ট হবে, এই সব নানা অজুহাত দেখিয়ে অরুণাচল সরকার চাকমাদের কোনও দাবিদাওয়া মানতে অস্বীকার করে এসেছে। অথচ ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকমাদের যেন ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।[১৭] ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী (Citizenship Act, 1955) চাকমারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার বৈধ অধিকারী।[১৮] তাই এঁদের সবরকম সংবিধান স্বীকৃত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করেছেন ভারতের শীর্ষ আদালত। তৎকালীন কেন্দ্রের মোরারজি দেশাই সরকারও বারে বারে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের কাছে চাকমাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন, কিন্তু কোনও সুপারিশ বা নির্দেশ এই রাজ্য সরকার বাস্তবে রুপায়ন করেনি। বরং চাকমাদের অরুণাচলের বাইরে কোন স্থানে বসতি গড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা আবেদন জানিয়েছেন। এই রাজ্যে (অরুণাচল) বসবাসকারী চাকমাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব যেন না দেওয়া হয় তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার আবেদন জানিয়েছেন। অরুণাচল সরকারের পক্ষ থেকে এমনও বলা হয়েছে যে, চাকমারা নাগরিকত্ব লাভের স্বত্বস্বরূপ আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করেননি।[১৯]

ভারতের বহুদলীয় ব্যবস্থার নানা সমস্যা, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অমসৃণ সম্পর্ক, দায়সারা মনোভাব, লাল ফিতের ফাঁস, AAPSU (All Arunachal Pradesh Students'Union) -র আন্দোলন, সরকারি উদাসীনতা ইত্যাদি চাকমাদের আজও পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। তাঁদের পরিচয় একটাই তাঁরা রাষ্ট্রহীন। আর রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীকে কোন সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ আপন করে নেয় না। তাঁরা সবসময়ই বৈষম্যর শিকার হয়ে থাকেন । একটি সংখ্যালঘূ সম্প্রদায়, যারা একটি জায়গায় প্রায় ৩০০ বছর ধরে বসবাস করছেন, ঔপনিবেশিক আমলেও নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন অথচ স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ৭০ বছর ধরে তাঁদের উপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের ধারা অব্যাহত রয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। APCSU (Arunachal Pradesh Chakma Students' Union) বারবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং সুপ্রিমকোর্টে নিজেদের নূন্যতম নাগরিক অধিকার ও উপজাতি তকমা লাভের দাবিতে হাজির হয়েছেন কিন্তু কোনও সুরাহা আজও পর্যন্ত হয়নি। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসে সংখ্যালঘুদের প্রতি এ একচরম ঔদাসীন্যতার পরিচয় বহন করে। চাকমা ছাত্রছাত্রীদের অরুণাচলের স্কুল, কলেজের প্রবেশের পথে নানা বাঁধা সৃষ্টি করা হয়। তাঁদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এমনকি নূন্যতম পরিষেবা পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া হয় না । সরকারি চাকরীতে এঁদের যোগদানের কোন সুযোগ একপ্রকার নেই বললেই চলে। APCSU -র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেক ছাত্রছাত্রীকে স্কুল কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশের এই সংখ্যালঘু উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে কেউ এখনও পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। তবে শেষে অনেক আবেদন নিবেদন ও আন্দোলনের পরে ২০০৪ সালে অরুণাচল প্রদেশে ভারতের ইলেকশন কমিশন দ্বারা মাত্র ১৪৯৭ জন চাকমাকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে।[২০] বাকি চাকমা উপজাতির মানুষেরা এখনও কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেননি, তাঁরা এখনও রাষ্ট্রহীন অবস্থায় বাস করেছেন।

ভারতের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক জীবন এবং ধর্মীয় রীতির চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদেশের বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় সকল সময়ই আধিপত্য করে এসেছেন। তাঁরা যেন ভারতীয় সমাজব্যাবস্থার নিউক্লিয়াস, তাই সংখ্যায় ক্ষুদ্র

হলেও এই সম্প্রদায় ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবশিষ্ট জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন । এই বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই যেন সবকিছু গড়ে উঠেছে অর্থাৎ সবকিছুতেই তাঁদের স্বার্থের দিকটা অতি সচেতনভাবে রক্ষা করা হয়েছে। কারণ তাঁরাই বেশিরভাগ সরকারি বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। চাকমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় হওয়ায় তাঁদের প্রতি ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের তেমন কোনও সহানুভূতি নেই। ফলে এই সম্প্রদায়ের মানুষের অভাব অভিযোগ, দাবি-দাওয়া কোন কিছুই এই দেশের নীতি নির্ধারক শ্রেণীর কর্ণকুহরে পৌঁছায়নি। তাছাড়াও চাকমা'রা সংখ্যায় এতই ক্ষুদ্র একটি উপজাতি সম্প্রদায় যে, তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতের চিরাচরিত রাজনীতির মূল ভিত নাড়াতে তেমন সক্ষম হননি। ফলে জনসমর্থনের অভাবে এই আন্দোলন তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। তাঁদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তাঁদের মধ্যে থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও নেতা বা নেত্রী জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতে উঠে আসতে পারেননি। ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল ক্ষেত্র যদি উত্তরভারত হয়, তাহলে একথা বলা বাহুল্যই যে, তাঁদের দাবিদাওয়া এই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সফল হয় নি। চাকমাদের মধ্যে কোন এক এমন শ্রেণী উঠে আসতে পারেননি যে, যারা সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বেশ প্রভাবশালী। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গ থেকে (অধুনা বাংলাদেশ) নমশূদ্র সম্প্রদায়ের এক বিশাল সংখ্যাক মানুষ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েক ধাপে অনুপ্রবেশ করেছেন। তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়ায় তাঁদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় সবসময় সচেষ্ট হয়েছেন। এঁদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশই ভোটাধিকার পেয়েছেন। তবে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট্রাংশ এখনও তাঁদের নানাবিধ দাবিদাওয়া অভাব অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক পথে আন্দোলন করে চলেছেন।

চাকমা'দের নিয়ে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির তেমন উৎসাহ না থাকার কারণ হল এই যে, এঁদের ভোটাধিকার নেই এবং এঁরা সংখ্যায় নগণ্য। জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় তাঁদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিবিশেষের আবির্ভাব না হওয়ার তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলি আজও অবহেলিত থেকে গেছে। তাঁদের সমস্যা জাতীয় স্তরের কোন সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হয়ত 'চাকমা' নামক কোন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের নাম পর্যন্ত এখনও শোনেননি, তাঁদের দাবি দাওয়া পর্যালোচনা করা তো দুরস্থান । ফলে এঁদের এখনও পরিচয় সংকট (Identity Crisis) নিয়ে ভুগতে হচ্ছে। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি যখন মানবিক কারণে ভোটব্যাঙ্কসর্বস্ব রাজনীতি পরিত্যাগ করে সমাজের সকলস্তরের মানুষের (জাতি,ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে) মঙ্গল কামনায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে পারবে, তখনই পৃথিবীর এই সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান প্রকৃত স্বার্থকথা লাভ করবে। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য নয়, দেশের সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যূনতম সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কোন প্রতিনিধি যখন দেশের রাজনীতির মূলস্রোত থেকে নিজেদের জাতির জন্য সফল প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে, সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল মেনে যখন উপজাতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় তাঁদের নিজস্ব পরম্পরাগত ঐতিহ্য পালনে কোন বাহ্যিক শক্তির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না, তখনই ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সফল হবে। এছাড়াও বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন নিয়ে অনুকুল সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় । বরাবরই ভারতের কেন্দ্র সরকার অঙ্গ রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে এসেছে এবং কোন সমস্যা সমাধানকল্পে কেন্দ্র শুধু দায়সারা মনোভাব নিয়ে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়ে এসেছে। অথচ ওই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিধি ব্যাবস্থা, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বা পরিকাঠামো আছে কিনা, এসব বিষয় নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনসময় বেশি উৎসাহী হতে দেখা যায়নি। এসব কিছুর পরিণতি, চাকমারা আজও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করে চলেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সংশ্লিষ্টদেশের উচ্চবর্ণের সংখ্যাগুরু মানুষ সেই দেশের সংখ্যালঘু নিম্নবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন ; ফলে তাঁদের শোষণ, শাসন, বঞ্চনায় সবসময় জর্জরিত হতে হয়েছে সংখ্যালঘুসম্প্রদায়কে। তবে আশার কথা এই যে, স্বাধীনতার এত বছর পর ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার বিষয়ে ভারতের সংখ্যালঘু শ্রেণীগুলি ওয়াকিবহাল হতে শুরু করেছে। শিক্ষায়, সমাজগঠনে, রাজনীতিতে তাঁরাও এগিয়ে আসছেন দেশকে নেতৃত্ব দিতে। তাঁরা নিজেদের অধিকারের দাবি জানাতে আন্দোলনে যোগদান করছেন। সমাজে বৈষম্য কিছুটা হলেও দূর হয়েছে। মেয়েরাও তাঁদের অধিকারের সমর্থনে আন্দোলনে সামিল হতে এগিয়ে আসছেন। আশাকরি, এইসব প্রচেষ্টা সফল হবে ও তা ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করবে। এটাই সকলের কাম্য ।

তথ্যসূত্র **:**

1. Talukdar, S.P., The Chakmas Life and Struggle, Gian publishing house, Delhi, 1988, p - 05.
2. Ibid
3. Majumdar, Chandrika Basu., Genesis of Chakma Movement in Chittagong Hill Tracts, Progressive publishers, Kolkata, 2003, p - 151.
4. Talukdar, S.P, Ibid; p - 06-07.
5. Ibid; p - 32.
6. Choudhury, Bikach Kumar, Genesis of Chakma Movement (1772-1989) Historic Background, Tripura Darpan Prakashan; Agartala, 1991, p - 03.
7. Talukdar, S.P., Ibid; p - 38.
8. Choudhury, Bikach Kumar., Ibid; p - 02.
9. Singh, Deepak K., Stateless in south Asia the Chakmas between Bangladesh and India, sage publications, Delhi, 2010, p - 15-17.
10. Ibid; p - 16.
11. Ibid; p - 57.
12. Dutta, Sreeradha., Bangladesh A Fragile Democracy, Shipra Publications, Delhi, 2004, p - 101.
13. Choudhury, Bikach Kumar., Ibid; p - 09-11.
14. Dutta, sreeradha., Ibid ; p - 102, 104.
15. Singh, Deepak K., Ibid; p - 120.
16. Ibid; p- 36-37.
17. The Times of India, 19 Sep, 2010, p - 12.
18. Singh, Deepak K., Ibid; p - 17, 172.
19. The Times of India, 27 Oct, 2015.
20. Singh, Deepak K., Ibid; p - 124.